

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 266 - 271

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সায়ন্তনী পূতভুন্ডের নির্বাচিত ছোটগল্পে একুশ শতকের কোভিড-নাইন্টিনের ভয়াবহ বাস্তবতা ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন

শ্রীমতি মৌমিতা মন্ডল

সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

শিলিগুড়ি কলেজ

Email ID: moumitasiliguricollege25@gmail.com

ID 0009-0005-3492-3887

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Pandemic,
COVID-19,
Lockdown,
Survival,
Insecurity,
Doctors,
Laborers,
Social Workers,
Brothel.

Abstract

The literature of the first two decades of the twenty-first century reflects various global events-particularly the rapid expansion of information technology and the devastating impact of the COVID or coronavirus disease on human life. Due to advancements in technology, human lifestyles have been undergoing continuous transformation through online platforms and various social media. Above all, the outbreak of the COVID pandemic in 2019 created a special thematic space in world as well as Bengali literature. Natural disasters such as floods, earthquakes, and pandemics have, across different eras, affected human society and literature in the same way as world wars and other global crises. Similarly, in the post-pandemic world of the twenty-first century, the reality of catastrophe has been strongly reflected in literature. In the second decade of the twenty-first century, Bengali short stories vividly capture the psychological stress, emotional sensitivity, and uncertainty caused by COVID-19. The crises that contemporary human life faced-fear, anxiety, loneliness, and alienation-have found powerful expression in the realistic and psychological portrayals of many writers' short stories. During the pandemic, COVID-19 emerged as an invisible and unpredictable enemy in human life. Issues such as strained personal relationships, insecurity in civic life, loss of livelihood, and images of hunger and deprivation became prominent themes in short stories of this period. Anyone infected with COVID-19-or even suspected of being infected-became a cause of fear and mental trauma. Therefore, it can be said that psychological anxiety occupies a central place in the short stories of this period. Loneliness, fear, frustration, and traumatic memories shattered the freedom of people across both rural and urban settings. The trend of Bengali literature during this phase can be identified as an important documentary testimony of the time. How fear affected people of every social class during lockdowns is vividly portrayed in the short stories of this period. Themes such as animal life, survival struggles, fear of death, hunger, migrant laborers, and displaced people recur frequently. Alongside these, the harsh realities of the contemporary healthcare system, doctors, and

administration have been realistically depicted in various stories. Among the short story writers of this special phase, the name of Sayantani Putatunda deserves particular mention. The diverse conflicts, crises, and psychological pressures of contemporary human life during the COVID pandemic are clearly reflected in her short stories. Sayantani Putatunda's stories from Story collection 'AAR JAANEY SHEI MEYE' (2022) such as 'VITU MANUSH', 'BYATHA' and 'SOCIAL DISTANCING', among others, are deeply rooted in the COVID situation.

Discussion

একুশ শতকে বিশ্ব জুড়ে ছেয়ে পড়া কোভিড মহামারীর বিধ্বংসী রূপ মানব সমাজকে প্রায় স্তব্ধ করে ফেলেছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ যেন মৃত্যুর দ্যুত হয়ে দেখা দিয়েছিল। করোনা ভাইরাস দমনের টিকা আবিষ্কারে বিলম্ব হওয়ায় জন সচেতনতা বাড়াতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যসংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রশাসন সমস্ত দিক দিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনোবল হারিয়ে নানা রূপ বিকৃত অভাবনীয় চিন্তার শিকার হয়ে পড়ে বিশেষত প্রবীণ ও নারী সমাজ। আলোচ্য প্রবন্ধের কয়েকটি গল্পে এই শ্রেণির মানুষের বিভিন্ন সম্পর্কের সংকট ও টানাপড়েনই সূক্ষ্ম রূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। 'ভীতু মানুষ' গল্পের প্রধান চরিত্র সুরেশবাবু কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির একজন ভুক্তভোগী এবং অদ্ভুত বিষণ্ণতার শিকার। এই অতিমারির তাণ্ডবকে রুখতে মানবজাতি আশ্রয় চেষ্টা চালিয়েছে তবে চিরাচরিত বিশ্বাস, প্রথা ভেঙে গিয়ে সমাজ তখন নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কগ্রস্ত। কোভিডের প্রকোপে মানুষ গৃহবন্দী, পাড়ার চায়ের দোকানের আড্ডাও উঠে গেছে তবে একটি কুকুর যাকে সবাই ভুলে বলে ডাকত সেই কুকুরের অবিরাম কান্নার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সুরেশবাবুদের আবাসনের কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা-

“যখনই সে কাঁদে, তার কয়েকদিন পরেই এই আবাসনে একটা করে মৃত্যু হয়! যে মুহূর্তে মানুষটা মারা যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই খেমে যায় ভুলু। যেন সে কোনও অতীন্দ্রিয় উপস্থিতি টের পায় এবং আগাম শোক প্রকাশ করতে থাকে... সাবধান! মৃত্যুদূত গুঁত পেতে আছে! সাবধান!”^১

ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আবাসনের রতনবাবু মর্নিং ওয়াকে যেতেন; হাই সুগার, নিউমোনিয়ার ধাত, দুর্বল লিভার- তাই একবার কোভিড ধরলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু বাস্তবতাকে মজার ছলে নিয়ে রতনবাবু বলেছেন -

“ছাড়ুন তো মশাই, ও সব কিস্যু না। মিডিয়া হাইপ দিয়ে ব্যাপারটাকে বাড়াচ্ছে, আর আপনাদের মতো ভীতু মানুষরা ভয় পাচ্ছে।”^২

প্রকৃতপক্ষে অপ্রত্যাশিত এই কোভিডের প্রকোপ যে কতখানি ভয়ঙ্কর হয়েছিল তার বিবরণ এই গল্পে পাওয়া যায়। ডাক্তার ছেলে বাইরের জীবাণু বাড়িতে নিয়ে এলে একদিন আবাসনের রতনবাবু হঠাৎ মারা যান; প্রাণবন্ত তনুজ চট্টোপাধ্যায় কোভিড পরীক্ষার রিপোর্টের অপেক্ষায় বিনা চিকিৎসাতে প্রাণ হারায়। গল্পে চরম বাস্তবতা ফুটে ওঠেছে, প্রচণ্ড জ্বরে হসপিটালের বেডে কাতর সুরে তনুজ বলেছে -

“ডাক্তারবাবু, আমায় ওষুধ দিন। নয়তো আমি বাঁচব না! প্লিজ, ওষুধ দিন!”^৩

এরপর কোভিডে আক্রান্ত হয়ে চলে যান আবাসনের রামেশ্বর বাবু; একে একে তাদের আবাসনের পাঁচজনকে কোভিড গ্রাস করেছে। প্লাস্টিকে মোড়া শব্দে চলে গেছে অথচ অস্তিম যাত্রায় পরিবারের প্রিয়জন কেউ সঙ্গী হতে পারেনি। সকলেই তখন স্তম্ভিত, নিরাশঙ্ক; শেষ বয়সে এমন করুণ পরিণতির কথা ভেবে সুরেশবাবুর দম বন্ধ হয়ে যায়। তাই আবাসন - ফ্ল্যাট তার কাছে মৃত্যুপুরী - গ্যাস চেম্বার বলেই মনে হয়, যেন প্রতিনিয়ত চলছে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। এক একটা দিন যেন এক্সটেনশন মনে হয় তার কাছে। একমাত্র সন্তান সুপ্তিশ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বিরাট

রাঙ্কে চাকরি করলেও লকডাউনের সময় আচমকায় কোম্পানি তাদের সমস্ত এমপ্লয়ীদের স্যালারি এক ধাক্কায় হাফ করে দেয় আর সেই অপমানে সুশীশ রেজিগনেশন দিয়ে বেকারত্বের জ্বালায় গৃহবন্দী হয়ে ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকে। চারিদিকে মারণ রোগের ভাইরাসের ছদ্মবেশে ছড়াছড়ি তাই বন্ধু-বান্ধবহীন সুশীশের মত যুবক ধীরে ধীরে রক্ষ, অসংযমী হয়ে পড়ে। লকডাউন চলাকালীন সুশীশ বাড়িতেই বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সংক্রমণের কথা সুরেশবাবু ছেলেকে স্মরণ করালে সে গর্জন করে ওঠে -

“করোনা করোনা আর করোনা! ... তুমি নিজে একটা মেন্টাল পেশেন্ট, আমাকেও তাই বানাতে চাও ... তুমি একটা ভীতু মানুষ! সারা জীবন ভয় পেয়ে মরেছ, আগামীতেও মরবে!”^৪

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কোভিডের ধাক্কা সামলাতে গাড়ি বিক্রি করে বাবার ওষুধ পত্র, ফ্ল্যাটের ইএমআই ইত্যাদি খরচ জুটিয়েছে। হঠাৎ জীবনে এতটা পরিবর্তন মেনে নিতে না পেরে সুশীশ মদ্যাসক্ত হয়ে পড়ে। সুরেশ বাবুর সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক এতকাল বাদে জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

কোভিডের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে হাওয়ায় মিলেছে লক্ষ লক্ষ জীবাণু; নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তা ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত আর বুক ভরে শ্বাস নিলেই ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে বিপদ। এ যেন প্রকৃতির ভয়ংকর ষড়যন্ত্র; অলিগলি জনশূন্য। প্রশাসনের তরফে জানা গেছে লকডাউনের ফলে মার্ডার, রেপ, এক্সিডেন্ট এর মত কেসের হার কমেছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক - সূত্রে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে যায়; আনন্দ, দুঃখ, বিষাদ, হর্ষ - সব কিছুতেই এখন মানুষ বড্ড অনুভবহীন। জীবনে প্রতি মুহূর্তে একটাই ভবিষ্যৎ আতঙ্কের অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখে মানুষকে -

“একবার কোভিড ধরলে কিন্তু আর রক্ষে নেই।”^৫

সুরেশবাবু সবসময় অনভিপ্রেত এক অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন কারণ পাড়ার কুকুর ভুলু তখনও কেঁদে চলেছে, তার কান্না থামার কোন লক্ষণই নেই। সুরেশ বাবুর মনের মধ্যে চলতে থাকে অদ্ভুত চিন্তার স্রোত; মনে পড়ে খবরের কাগজের কথা-

“এই লকডাউনে অনেক বয়স্ক আচমকাই হার্টফেল করে মারা গিয়েছে। তবে কি তিনিও হার্টফেল করবেন? এখন যদি কিছু হয়ে যায়, যদি অক্সিজেন লাগে, তবে কী হবে! চতুর্দিকে এখন অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য হাহাকার! তবে কি অক্সিজেন ছাড়াই মারা যাবেন!”^৬

এমন দ্বিধা-শঙ্কা বৃকে নিয়ে সুরেশবাবু বাঁচার স্বপ্ন দেখেছেন। ঠিক তখনই নিচের ফ্ল্যাটের প্রফুল্লর স্ত্রী অবস্তিকার শ্বাসকষ্ট শুরু হলে অক্সিজেনের ব্যবস্থার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলে ছেলে সুশীশকে তিনি দরজা খুলতে প্রবল বাধা দিয়ে চিৎকার করে বলেছেন - “খবর্দার দরজা খুলবি না।”^৭ কয়েকদিন ধরে ভুলুর কান্নার সুরে তিনি বুঝেছেন যে এই ডাক প্রতিবেশীর নয়, এই ডাক একটা ফাঁদ মাত্র; দরজা খোলার সাথে মৃত্যু ফাঁদ পেতে ফেলবে। তাই ছেলেকে সতর্ক করেছেন-

“যদি কাল আমার কোভিড হয় তাহলে প্রফুল্ল দেখতে আসবে?”^৮

সুতরাং কোভিডের ভয়াবহ সত্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব মানুষকে অসহায়, নিঃসঙ্গ ও কর্তব্যবিমুখ করেছে। সুশীশের মনে সংশয় তৈরি হলেও চূড়ান্ত ভীতু মানুষ বাবার কারণে পিছিয়ে আসে। সুরেশবাবুর মানসিক আতঙ্কের বর্ণনা লেখিকা দিয়েছেন-

“চতুর্দিকে গুচ্ছ গুচ্ছ স্যানিটাইজারের শিশি। কোনওটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার কোনওটা সারফেস! গত তিন দিনে অন্তত ত্রিশটা স্যানিটাইজার কিনেছেন তিনি। কোনটা কোভিডের জীবাণুর জন্য অব্যর্থ তা বুঝতে পারেন নি। তাই একসঙ্গে একগাদা স্যানিটাইজার কিনে রেখেছেন! বাইরে কোথাও বেরোন না, অথচ দশ মিনিট অন্তর অন্তর হাত স্যানিটাইজ করে যাচ্ছেন!”^৯

প্রাণদায়ী প্রাকৃতিক হাওয়াই এখন বিষাক্ত। ভুলুর চিৎকারের মর্মার্থ কাউকে বোঝানো যাবে না তাই স্বার্থপরের মত প্রতিবেশীর সাহায্য প্রার্থনাকে উপেক্ষা করে সুরেশবাবু। দরজা খুললেই বাইরের বিপদ যাতে ঘরে প্রবেশ না করে তাই সুশীশকে আটকে দিয়ে ভেবেছেন -

“ওরা সবাই নিষ্ঠুর, ওরা সবাই স্বার্থপর। ওরা কেউ তাঁর কথা ভাবে না! কিন্তু তাঁকে বাঁচতে হবে। বাঁচতেই হবে।”^{১০}

এই গল্পে কোভিডের ভয়াবহতার পাশাপাশি লেখিকা সায়ন্তনী পূততুলু সম্পর্কের টানাপড়েন ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা কতটা প্রবল ও মর্ম বিদারক হয়েছিল তার আরেকটি দৃষ্টান্ত ‘ব্যথা’ ছোটগল্প। এই গল্পের মূল চরিত্র একজন বৃদ্ধ পেশেন্ট যিনি ব্যথার কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন ডাক্তার - ডেন্টিস্ট, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিস্ট, ইএনটি দের কাছে বারে বারে ছুটে গিয়েছেন কিন্তু ব্যথার প্রকৃত কোনও কারণ ডাক্তারেরা খুঁজে পাননি। অনেক যোঝাযুঝির পর বৃদ্ধ স্বীকার করেন - ব্যথা যে আসলে কোথায় সেটা তার নিজেরও জানা নেই। ফলে ডেন্টিস্ট এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ সকলেই বুঝেছেন রোগীর এই ব্যথা মানসিক কেননা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন-

“সব ডাক্তারেরা তোতাপাখির মতো একই কথা আউড়ে যাচ্ছেন। আমার নাকি কোনও অসুখই নেই, কোনও ব্যথা নেই! রিপোর্ট কি ভুল হতে পারে না?”^{১১}

এই ব্যক্তিটির অসম্ভব ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড দেখে ডাক্তার অবাধ কেননা কোভিডের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এই বৃদ্ধ বিভিন্ন ডাক্তারের চেম্বার ঘুরে ঘুরে নাম লিখিয়েছেন ব্যথা নিরাময়ের জন্য। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতি তার জন্য অনুকূল নয় -

“এই বয়েসে যদি একবার কোভিড ধরে তবে রক্ষে নেই। ভদ্রলোক কি জানেন না যে এই মুহূর্তে হসপিটাল, ডাক্তারের চেম্বারই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক স্থান! সেখানেই কোভিড নাইন্টিনের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা প্রবল!”^{১২}

প্রকৃতপক্ষে এই বৃদ্ধ ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পান না শুধু একা মরতে ভয় পান। কোভিডের সংক্রমণে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বৃদ্ধের এমন শিরোনামে সংবাদ প্রায় দৈনন্দিন টিভির পর্দায় তখন ভেসে উঠছে - একাকী, নিঃসঙ্গ শ্বাসকষ্টে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে রোগী অথচ কেউ জল দেয়নি, একাকী বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে পরাস্ত হয়েছে। লকডাউন চলাকালীন চেনা মানুষই অচেনা, প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসনে গৃহবন্দী। একাকী এই বৃদ্ধ জীবনের শেষ পরিণাম ভেবেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন এবং ইন্টারনেট ঘেঁটে এক এক করে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে নাম লেখান, কারণ -

“সেখানে অন্তত মানুষ আছে। হাতের কাছে ডাক্তার আছে, সে দাঁতেরই ডাক্তার হোক বা হাড়ের, তবু ডাক্তার তো! এখানে অন্তত বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না।”^{১৩}

সুতরাং এই মনের অসুখ-আতঙ্ক বা ব্যথা তিনি কাউকে বলে বোঝাতে পারবেন না। কেবল ডাক্তারের চেম্বারে তিনি নিশ্চিত থাকেন, তার নিজের বাড়ি গ্যাসচেম্বার মনে হলেও ডাক্তারের চেম্বারই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হয়। কোনমতে রাতটুকু বাড়িতে দমবন্ধ করে কাটিয়ে পরের দিনের অপেক্ষা করেন কারণ -

“তাকে আবার ব্যথার ওষুধ খুঁজতে যেতে হবে।”^{১৪}

কোভিড পরিস্থিতিতে নিঃসঙ্গ মানুষকে ঘিরে ধরেছিল এক অজানা আতঙ্ক - মৃত্যু ভয়; ‘ব্যথা’-গল্পের চরিত্রটি তার একটি উদাহরণ স্বরূপ।

‘আর জানে সেই মেয়ে’ গল্প সংকলনের আরও একটি গল্প ‘সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং’ যার বিষয় কোভিড চলাকালীন সমাজের এক প্রান্তে অবস্থিত একশ্রেণীর মানুষের মুখোশ উন্মোচন এবং আর অন্যদিকে একশ্রেণীর অভাবনীয় নৈতিক জাগরণ। তাছাড়া এই গল্পে কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নিয়মাবলী যেমন - মাস্ক পড়া,

নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জমায়েত স্থানে না যাওয়া, স্যানিটাইজারের ব্যবহার ইত্যাদি সতর্কতা মূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য ‘সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং’ গল্পে সমাজের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুই নারী শ্রমজীবী, গণিকা কমলা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ও অভিনেত্রী মালবিকার বিপরীতমুখী জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাঠককে আশ্চর্য-অভাবনীয় এক বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। কোভিড মহামারীর প্রকোপ সম্পর্কে গল্পের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে -

“তখন কেউ ভাবতে পারেনি, যে রোগটার নামও ঠিকমতো জানে না, সেই কোভিড নাইন্টিন কার্যক্ষেত্রে গোটা শহরকেই গৃহবন্দী করে দেবে! এখন লক ডাউনে সবার রুটি রুজি বিপন্ন!”^{২৫}

এরূপ পরিস্থিতিতে সমাজের শ্রমজীবী ব্রথেল বা রেড লাইট এরিয়ার নারীদের জীবন সংকটের বাস্তব ছবি এই গল্পে পাওয়া যায়। সমাজসেবী ও অভিনেত্রী মালবিকা পৌঁছে যায় রেড লাইট এরিয়ায় মানুষগুলোর মধ্যে চাল-ডাল বিতরণের জন্য। সেই সময় অনাহারে অপুষ্টিতে ক্লান্ত এক সন্তানের জননী গণিকা কমলা অজ্ঞানতাবশত অভিনেত্রী মালবিকাকে স্পর্শ করে ফেলে; আত্মপ্রচারের কারণে মালবিকা নিউজ ক্যামেরার সামনে শান্ত হয়ে ছিল বটে কিন্তু মনে মনে আফসোস করে -

“কেন যে মরতে এসেছিলেন! ... এদের গায়ের ও মুখের দুর্গন্ধ তাঁর লক্ষ্যধিক মূল্যের পারফিউমকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে! চর্মরোগ, রাজ্যের নোংরা জামা-শাড়ি দেখে ভয়ে সিঁ টি য়ে আছেন! মালবিকার মনে হয় কোভিডের থেকেও হয়তো মারাত্মক জীবাণু নিয়ে ঘুরছে এরা! তার ওপর সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের বালাই নেই! সুযোগ পেলেই ছড়মুড়িয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ছে! এ কী জাতীয় অসভ্যতা!”^{২৬}

রেড লাইট এরিয়ার এক গণিকা তাকে স্পর্শ করেছে বলে আতঙ্কে বারবার স্যানিটাইজার মেখেছেন। রিল আর রিয়েল লাইফের মাঝে কতখানি সামাজিক দূরত্ব তা মালবিকা এখন বুঝেছেন। এ প্রসঙ্গে কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতিতে ব্রথেলের নারীদের জীবন যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। লেখিকার বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রকাশ এক্ষেত্রে ঘটেছে -

“ব্রথেল মানেই নানারকম দুরারোগ্য ও ছোঁয়াচে রোগের ঘাঁটি। যৌনকর্মীদের মধ্যেই এস টি ডি অর্থাৎ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ সবচেয়ে বেশি! ওদের মরার জন্য কোভিডের প্রয়োজন বিশেষ হয় না। ... স্বয়ং কাল হয়ে বসে আছে এইচ আই ভি এডস। মরার জন্য এগুলোই যথেষ্ট, কোভিড তো বাহুল্যমাত্র!”^{২৭}

সমীক্ষায় জানা গেছে ভারতে শুধুমাত্র ব্রথেল খুলে দিলেই কোভিড সংক্রমণ চার লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। কোভিড সংক্রমণে দেশে তখন মৃত্যুর হার ক্রমশই বেড়ে চলেছে অথচ অনলাইন এবং ভার্চুয়াল সেক্সের রমরমা কীভাবে এই সময় চলেছে তার দৃষ্টান্ত এই গল্পে পাওয়া যায়। মালবিকা ‘হেল্প মি টু হেল্প ইউ’ নামে নিজস্ব একটি সাইট খুলেছে কামার্ত পুরুষদের জন্য। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার দিয়েই গোল্ড, প্ল্যাটিনাম নানা রকম প্যাকেজের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে। সুন্দরীদের কাজের উপর নির্ভর করে টাকার অঙ্ক -

“এই সাইটে কর্মী হিসেবে আছে গৃহবধু থেকে কলেজ গার্ল অবধি সবরকমের সব বয়েসের নারী! সব মিলিয়ে দিনে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার! তবে এরা কেউ বেশ্যা নয়! হাই প্রোফাইল!”^{২৮}

অথচ গল্পের আরেক প্রান্তে অবস্থিত গণিকা কমলা কোভিডের আগ্রাসী দাবাকে অগ্রাহ্য করে আরো ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই লকডাউনে কড়া প্রহরা এড়িয়ে সন্তান পালনের তাগিদে একাকী এক চিত্রকরের কাছে চোদ্দ হাজারে দেহ প্রসারিনী হয়েছে। কিন্তু পাঠক আশ্চর্যস্থিত হয়েছে যখন স্তন পানরত সন্তান কোলে কমলার প্রতিকৃতি ক্যানভাসে ভার্জিন মেরির রূপ লাভ করে-

“ক্যানভাসে যিনি আছেন তাঁকে ছবছ কমলার মতই দেখতে। ... চোখে অনাবিল স্নেহধারার সঙ্গে সংশয়ের সংযম। একদিকে একা কুমারী মা কী করে এই অভাবের মধ্যে শিশুকে বড় করে তুলবে, মানুষ করবে সেই দুশ্চিন্তা। অন্যদিকে পরম বাৎসল্য দৃষ্টি চুঁইয়ে পড়ছে!”^{২৯}

শ্রমজীবী গণিকা কমলা নিজেই এমন পবিত্র ভার্জিন মেরি রূপে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। গণিকার মধ্যেও যে পবিত্রতা থাকতে পারে এই অভিনব মূল্যবোধের প্রকাশ এক্ষেত্রে ঘটেছে –

“পোশাক খোলার সর্বাধিক মূল্য আজ পেয়ে গিয়েছে। আর কিছু পাওয়ার নেই!”^{২০}

অন্যদিকে সমাজসেবী ও অভিনেত্রীর নামের আড়ালে মালবিকা তার স্বামী, সন্তান থাকা সত্ত্বেও ভার্চুয়াল সেক্স কর্মী রূপে নিজ চারিত্রিক ধর্মের পতন ঘটিয়েছে। প্রকৃত গণিকা কমলার ভদ্রতর সমাজে উত্তরণের প্রচেষ্টায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আর ক্ষমতা ও চাকচিক্যময় জীবনে অভ্যস্ত নায়িকা মালবিকার অনলাইনে ভার্চুয়াল সেক্স সাইটে রোজগারের মাধ্যমে গণিকায় পর্যবসিত হওয়া- এই দুই নারী জগতের রূঢ় বাস্তবতাকে লেখিকা সায়ন্তনী পূততুণ্ড তুলে ধরেছেন। অতএব কোভিড পরিস্থিতি অবলম্বনে রচিত এই গল্পগুলিতে তৎকালীন সমাজের যেমন অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য চারিত্রিক উত্থান-পতন যেমন দেখা গেছে তেমনই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটও ভিন্ন মাত্রায় সংযোজিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Reference:

১. পূততুণ্ড, সায়ন্তনী, ‘আর জানে সেই মেয়ে’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৩
২. তদেব, পৃ. ২৩
৩. তদেব, পৃ. ২৪
৪. তদেব, পৃ. ২৮
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ৩২
৭. তদেব, পৃ. ৩৩
৮. তদেব, পৃ. ৩৩
৯. তদেব, পৃ. ৩৪
১০. তদেব, পৃ. ৩৫
১১. তদেব, পৃ. ৪০
১২. তদেব, পৃ. ৪০
১৩. তদেব, পৃ. ৪২
১৪. তদেব, পৃ. ৪২
১৫. তদেব, পৃ. ৭৯
১৬. তদেব, পৃ. ৮১
১৭. তদেব, পৃ. ৮২
১৮. তদেব, পৃ. ৯২
১৯. তদেব, পৃ. ৯৩
২০. তদেব, পৃ. ৯৪